সাহায্য

আহমেদ সাবের

-১-

চার বছর পর গ্রামের বাড়ী এলাম। ঢাকা থেকে বাসে আড়াই ঘন্টার রাস্তা। তবু দাদাজান মারা যাবার পর গত চার বছরে আমার বাবা, মা, ভাই, বোনেরা - কেউই একবারও দেশের বাড়ীতে যান নি। সবাই ব্যাস্ত, চাকরী বাকরী কিংবা লেখা-পড়া নিয়ে। আর আমি ছিলাম দেশের বাইরে - সুদুর আমেরিকায়।

অবশ্য এবার আসার প্রধান কারন হচ্ছে, বেলু চাচার মেয়ে, আমার চাচাতো বোন রিক্তার বিয়ে। ছোট চাচা বেলায়েত হোসেন, যাকে আমরা বেলু চাচা বলে ডাকি, তাঁর একান্ত ইচ্ছা, ওনার মেয়ে রিক্তার বিয়ের সময়টা যেন আমরা দেশের বাড়ীতে ওনাদের সাথে থাকি।

আমি আমেরিকা যাবার পর একবারও দেশের বাড়ীতে আসিনি। যদিও বছর দুয়েক আগে একবার দেশে এসেছিলাম, কিন্তু সময়ের অভাবে গ্রামের বাড়ীতে আর আসা হয়ে উঠেনি। চাচা, চাচী, চাচাতো ভাই-বোনেরা, যারা দেশের বাড়ীতে থাকেন, তারা সবাই আমাকে দেখতে চেয়েছেন বলে বেলু চাচা জানিয়েছেন। তাই এবার দেশে এসেই ঠিক করলাম, একবার দেশের বাড়ী যাব। রিক্তার বিয়েটা আমার যাবার ইচ্ছাটাকে ত্বরান্বিত করল। আমি আর মা আগে এসেছি। আমার দু বোন, বিথী আর তিথির পরীক্ষা সামনে বলে, ওরা বিয়ের দিন আসবে।

বাস জার্নিটা মন্দ হলোনা। চার বছর আগে যে পথ পার করতে, ঝকর ঝকর মুড়ির টিন বাস আর পায়ে হেটে চার-পাঁচ ঘন্টার মত লাগতো, এবারে তা অর্ধেক সময়ে পার করে দিলাম মোটামুটি পরিচ্ছন বাসে, আরামদায়ক সীটে বসে। গাদাগাদি ভীড়ও নেই।

বড় রাস্তা থেকে নেমে, ধান ক্ষেতের মাঝ দিয়ে তিনশ মিটারের মত একটা সরু রাস্তা ধরে আমাদের বাড়ীতে পৌঁছাতে হয়। সে রাস্তা দিয়ে কষ্টে-শিষ্টে কোন মতে বাড়ী পর্য্যন্ত রিক্সা টেনে নেওয়া যায়। বেলু চাচা নিজে আমাদের নিতে এসেছেন বড় রাস্তায়। সাথে দুজন কামলা, আমাদের মাল-পত্র বয়ে নেবার জন্য, যদিও আমার আর মায়ের সামান্য জিনিষ পত্র বয়ে নেয়ার জন্য আমিই যথেষ্ট। তার উপর একটা রিক্সাও ডাকা হয়েছে, আমাদেরকে বাড়ী নেবার জন্য।

বেলা সাড়ে দশটা বাজে। শীতের চনমনে রোদ উঠেছে নির্মেঘ আকাশে। রাস্তার দুই পাশে শষ্যহীন মাঠে ধানের নাড়াগুলো মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে জুতার ব্রাশের ব্রিষ্টলের মতো। মা কিছুতেই রিক্সাতে উঠলেন না। আমার তো প্রশ্নই আসে না। আমরা সবাই পায়ে হেটেই চললাম।

ভাবী, এই জমিটা কিনলাম এবার। মাকে বড় রাস্তার পাশে এক খন্ড ভিটা জমি দেখিয়ে বললেন বেলু চাচা।

কি করবা এত জমি দিয়া। মায়ের মন্তব্য। গত মাসেও তো শুনলাম, তিন বিঘা কিনছ।

অন্য জমি আর এই জমি এক হইলো ভাবী? এইটা কিনলাম, বড় রাস্তা থেইকা আমাগো বাড়ী পর্য্যন্ত একটা ইটের রাস্তা করনের লাইগা। মেহমান টেহমান আসলে বড় রাস্তা থেইকা রিক্সায় কইরা আমাগো বাড়ী নিতে হয়। এতে আমাগো সন্মানটা কই থাকে ভাবী? রুবেল অপিস থেইকা একটা গাড়ী পাওনের কথা। গাড়ীর রাস্তা না থাকলে গাড়ী দিয়া কি হইবো? তাই জমিটার দরকার পড়লো। কালে ভদ্রে আপনারা বাড়ীত আসলে গাড়ী নিয়া বাড়ীর উঠানে নামতে পারবেন।

রুবেল আমার চাচাতো ভাই। ঢাকায় কোন একটা ব্যাঙ্কে চাকরী করে। ঈদে মিলাদে বাড়ী যায়।

জমিটায় আনু ভাইয়ের বাড়ী ছিলোনা? ওরা গেলো কই? আমার প্রশ্ন।

কই আর যাইবো রাজীব, নদীর পারে ছাপড়া তুইলা আছে। বুদ্ধি-সুদ্ধি না থাকলে যা হয়।

কথাটা শুনে আনু ভাইয়ের জন্য আমার বেশ কষ্ট হলো। উনি আমাদের বাড়ীতে মাঝে মধ্যে কামলা খাটতেন। ছোট কালে আমরা যখন বাড়ীতে আসতাম, আমার চেয়ে সাত-আট বছরের বড় হলেও, সময় পেলেই উনি আমাদের সাথে ফুটবল খেলায় যোগ দিতেন। ওনার কাছে আমি ঘুড়ি উড়ানো শিখেছিলাম। গরীব ঘরে যা হয়, ওনার বাবা ওনাকে অল্প বয়সে বিয়ে করিয়ে দিয়েছিলেন। দেখতে দেখতে আমার চোখের উপরই ওনার দু মেয়ে আর একটা ছেলে হলো। ছেলে মেয়েরা স্কুলে যাওয়া শুরু করলো। শেষ যখন দেখেছি, ওনার ছোট ছেলে কালাম বোধ হয় সবে স্কুলে যাওয়া শুরু করেছিলো।

আমরা বাড়ীর সীমানায় চলে এসেছি। প্রথমেই পুকুর। কতবার এ পুকুরে সাঁতার কেটেছি, তার ইয়াত্তা নেই। এখন আর তাতে সাঁতার কাটার জো নাই। সারা পুকুর জুড়ে মাথা তুলে আছে বাঁশের কঞ্চি।

পুকুরে মাছের পোনা ফেলছি ভাবী, তেলাপিয়া আর নাইলোটিকা। দেখেন, কেমন কিলবিল করতাছে। আঙ্গুল তুলে মাকে দেখালেন বেলু চাচা।

আমিও দেখলাম। পুকুরের এক পাশে বাধানো সিড়ি হয়েছে; তাতে তিন-চার জন লোকের জটলা। বোধ হয় রোদ পোহাচ্ছে।

বাড়ীর সামনের আব্রুটা আগে মতই আছে। বাইরের বৈঠককানার পাশে দুটো মুলি বাঁশের বেড়ার আড়াআড়ি ঘের, যাতে ভেতরের উঠানটা বাইর থেকে দেখা না যায়।

রিক্তা, রিক্তা, দেখ কারা আইছে। উঠানে পা রেখেই হাঁক দিলেন বেলু চাচা। মুহুর্তের মধ্যে আমাদেরকে ঘিরে আত্মীয় স্বজনের একটা একটা কুন্ডলী গড়ে উঠলো, যাদের কয়েক জন ছাড়া বাকীরা আমার অচেনা।

ছোট চাচী, যাকে আমরা পারু চাচী বলে ডাকি, দ্রুততার সাথে সবার সঙ্গে আমাদের পরিচয় করিয়ে দিলেন। বেশীর ভাগই রিক্তার বিবাহ উপলক্ষে আসা দূর সম্পর্কের আত্মীয় স্বজন।

-২-

রাতে খাবার-দাবার পর আমরা বেলু চাচার শোবার ঘরে বসলাম বিবাহ সংক্রান্ত আলাপ আলোচনার জন্য; আমি, মা, চাচা, চাচী, চাচীর এক বোন।

আপা, ছেলে সৌদি আরবে থাকে। নাম মকবুল। ইন্টারমেডিয়েট পাশ। পারু চাচী মুখে এক খিলি পান দিয়ে মায়ের মুখে কথার সুত্র ধরিয়ে দিলেন।

মেয়েটারে আর একটা বছরের জন্য বি,এ টা পাশ করতে দিলা না। মা বলে উঠেন।

আপা, ভাল বংশের ছেলে পাইলাম, তাই আর দেরী করলাম না। আমার বুবুই সম্বন্ধটা নিয়া আসলো। পারু চাচী পাশে বসা বোনকে দেখিয়ে বলেন। বুবুর বড় ছেলেও সৌদিতে থাকে। মকবুলের সাথে জানাশোনা আছে।

কি কাজ করে ছেলে? আমি প্রশ্ন করি।

ব্যাটা মানুষের আর কাজ কর্ম কি? মাসে মাসে দেশে টাকা পাঠায়। জনি জমা কিনছে অনেক। বেলু চাচার মন্তব্য।

রিক্তাকে নিতে পারবে?

না। তবে মকবুল বলছে, বেশী দিন বিদেশে থাকবো না। দেশে আইসা দোকান দিবো। ভাবী, এখন খরচ বরচ নিয়া একটু আলাপ করা দরকার। হীরু ভাই নাই, এখন আপনিই মুরুব্বী। চাচা আসল প্রসঙ্গে চলে যান।

গয়না-টয়না, কাপড়-চোপড় তো দেখলাম। খুব সুন্দর হইছে সব।

গয়না পাতি আনা হইছে সৌদি থেইকা। চাচী যোগ দেন।

আসল খরচই তো সামাল দিছ। খাওয়া-দাওয়ার খরচ ছাড়া আর বাকী থাকলো কি?

কন কি ভাবী! প্রথম মেয়ের বিয়া। একটু আমোদ ফুর্তি না হইলে কি চলে। ঢাকা থেইকা ব্যান্ড আসবো। বাবুর্চী পুরান ঢাকার। ঢাকা থেইকা বাস নিয়া মেহমানরা আসবো। মেম্বার, চেয়ারম্যান, এম পি, কেউই বাদ নাই। মিনিষ্টার ফজলুল হুদা সাহেবও আসতে পারেন। তবে শেষ মুহুর্তে কি হয় বলা যায় না। প্রধান মন্ত্রী হয়তো ডাইকা বসলেন ওনাকে। পানির মত টাকা খরচ হইতাছে ভাবী। আপনারা আছেন বইলাই বুকে বল আছে। আমার মেয়ে যা, আপনার মেয়েও তা। মেয়ের বিবাহে খরচ পাতি কিছু করবেন না? আপনার ভাগে খরচ ধরছি মোটে এক লাখ টাকা।

কও কি বেলু, আমি দুই পয়সার মানুষ না, আমার ভাগে ধরছ এক লাখ! আকাশ থেকে পড়েন মা। আমি একটা গহনার সেট লইয়া আসছি। খরচ পড়ছে সত্তর হাজার। আমি আর কিছু দিতে পারুম না বেলু। তোমারও ধার দেনা কইরা এত খরচ করার দরকারটা কি? তোমার তো আরো একটা মাইয়া আছে।

হীরু ভাই বাইচা থাকলে আপনি এই কথাটা কইতে পারতেন ভাবী? ওনার কাছে ভাইয়ের মেয়ে যা, নিজের মেয়েও তা। বলতে বলতে কেঁদে ফেলেন বেলু চাচা। উনি বাইচা থাকলে নিজে সব খরচা পাতি দিয়া ধুমধাম কইরা রিক্তার বিবাহ দিতেন। আমারে আল্লা তৌফিক দেন নাই মাইয়াটারে মনের সাধ মিটাইয়া ধুমধাম কইরা বিদায় করি।

আমি এত টাকা পামু কই? তোমার ভাই তো প্রভিডেন্ট ফান্ড এর সামান্য কিছু টাকা ছাড়া আর কিছু রাইখা যান নাই। সেই টাকারও বেশীর ভাগ খরচ হইছে রাজীব আমেরিকা পড়তে যাওনের সময়। তাছাড়া আমার নিজেরওতো দুইটা মেয়ে আছে।

ভাবী, আপনার কথায় হীরু ভাই উপর থেইকা মনে কষ্ট পাইবো। রিক্তার মামা সামান্য ব্যাবসা কইরা এক লাখ টাকা দিছে। রুবেলের নতুন চাকরী; সেও দিছে পঞ্চাশ হাজার। আর আপনারা ঢাকা শহরে থাইকা সামান্য টাকাটা দিতে পারবেন না? মাসাল্লাহ, রাজীবতো শুনছি ভাল চাকরী করে বিদেশে। সে ইচ্ছা করলে এর দ্বিগুন টাকা দিয়া দিতে পারে।

আমি? আমি চমকে উঠি চাচার কথায়। আমার অল্প দিনের চাকরী।

হেড মাষ্টার সাবের মুখে কথায় কথায় শুনলাম, তুমি নাকি স্কুলকে টাকা পয়সা দিয়া সাহায্য করবা বইলা কথা দিছ। তোমার বাপের মাথায় আছিলো পাগলামী। সেইটা তোমার মাথায়ও ভর করছে। স্কুলে টাকা দিবার দরকারটা কি? তার জন্য সরকার আছে। সেই টাকাটা স্কুলকে না দিয়া তুমি তোমার বোনের বিবাহে খরচ করতে পার না?

চাচা, টাকাটা স্কুলকে দিলে কত গরীব ছেলে মেয়ের কাজে লাগবে।

রাজীব, শরিয়ত মোতাবেক সাহায্যের হক গরীব আত্মীয় স্বজনের হইলো সবার উপরে। তার পর হইলো পাড়া প্রতিবেশী। তুমি মাওলানা সাবেরে জিজ্ঞাস কইরা দেইখো।

চাচা, আপনি তো গরীব না।

এইটা কি কইলা রাজীব, আমি গরীব না, তবে কে গরীব? ধার দেনায় ডুইবা আছি। তুমি নিজের চাচারে সাহায্য না কইরা টাকাগুলান পানিতে ফেইলা দিতে চাও। চাচার কণ্ঠে রীতিমত বিতৃষ্ণা। বড় রাস্তা থেইকা বাড়ী পর্য্যন্ত রাস্তা করতে এক লাখ দশ হাজার টাকার মত খরচ হইবো। রিক্তার বিয়ার ঝামেলায় কামটা পিছাইয়া গেলো। বোনের বিবাহে কিছু না দিলা, অন্ততঃ রাস্তা বানানোর খরচের অর্ধেকটা দাও। বাড়ী কি আমার একার? রাস্তার খরচ আমি একা দিমু ক্যান? তোমাগো কি কোন দায়-দায়িত্ব নাই। চাচার কণ্ঠস্বর ক্রমেই চড়তে লাগলো।

রাজীব স্কুলের লাইগা পঞ্চাশ হাজার টাকা নিয়া আসছে। সেই টাকাটা স্কুলে দেওনের বদলে তোমারেই দেওয়া হইবো। আমাকে আর কিছু বলার সুযোগ না দিয়ে, মাঝখানে বলে উঠলেন মা। আর যে হারটা আমি আনছি, সেইটাও দিমু। এখন চুপ কর।

আমি আর কথা বাড়াইনা। হাজার হোক, মা যখন কথা দিয়ে ফেলেছেন।

-৩-

বাড়ীতে মহা হুলুস্থল ব্যাপার। বিয়ে পরশু দিন। আত্মীয় স্বজন অনেকেই এর মধ্যে চলে এসেছেন। বড় রাস্তা থেকে বাড়ী পর্য্যন্ত দুটো গেট বসানো হচ্ছে; লাইট লাগানো হচ্ছে একটু পর পর। চাচা বারবার আফসোস করছেন, রিক্তার বিয়ের আগে রাস্তাটা করা গেলো না। তা হলে বর যাত্রীরা বাড়ী পর্য্যন্ত গাড়ী নিয়ে আসতে পারতেন। এখানে সেখানে লোকজন ছড়িয়ে ছিটিয়ে। কেউ তামাশা দেখছেন, কেউ ডেকোরেটরদেরকে নানা ভাবে পরামর্শ দিচ্ছেন। এ নিয়েও আবার আত্মীয় স্বজনদের মধ্যে কথা কাটাকাটি হচ্ছে। দুপুরের পর আমি করনীয় কিছু না পেয়ে মাকে বলে বেরিয়ে পড়লাম।

বাড়ীতে আসার পর তিন দিন কেটে গেছে। হেড মাষ্টার সাহেবের সাথে দেখা করার ইচ্ছা থাকা সত্বেও দেখা করতে পারিনি। ওই প্রাইমারী স্কুলে বাবা পড়েছেন, আমরা পড়েছি। বাবা বেঁচে থাকতে স্কুলকে নিয়মিত সাহায্য করতেন। বাবা এক্সিডেন্টে মারা যাবার পর সে সাহায্য বন্ধ হয়ে যায়। মায়ের কাছ থেকে ঠিকানা নিয়ে হেড মাষ্টার সাহেব আমার সাথে যোগাযোগ করেন। আমি কথা দেই, আমি যখনি দেশে আসবো, সামর্থ অনুসারে স্কুলকে কিছুটা সাহায্য করব। সে মোতাবেক, স্কুলের জন্য পঞ্চাশ হাজার টাকা আলাদা করে রেখেছিলাম। গতকাল সে টাকাটা চাচার হাতে তুলে দিয়েছি।

টাকাটা দেবার পর, মনটা বেশ খারাপ হয়ে আছে। হেড মাষ্টার সাহেবেকে কথা দিয়েও কথাটা রাখতে পারলাম না। যাক, যা হবার হয়ে গেছে। কথাটা ওনাকে একবার বলে আসি। উনি বড় আশা করে আছেন। শীতকাল বলে মাঠে পানি নেই। ধান উঠে গেছে। শূন্য মাঠের মাঝ দিয়ে, ধানের নাড়া মাড়িয়ে চললাম স্কুলের পথে। দুর থেকে স্কুলের জরাজীর্ন ঘরটা দেখে শৈশবের কত স্মৃতি মনে পড়ে গেলো।

স্যারকে স্কুলেই পাওয়া গেলো। সেই একই যায়গায়, একই চেয়ারে, চার জন ছাত্রের মাঝখানে। বয়স আর চুলের রঙটা ছাড়া অন্য কোন পরিবর্তন নাই। আমরা যখন ক্লাস ফাইভে বৃত্তি পরীক্ষা দিয়েছিলাম, ঠিক এমনি করেই স্যারকে ঘিরে আমরা বসতাম। দিনের পর দিন, স্যার আমাদেরকে পড়িয়েছেন; বিনিময়ে কিছু চাননি। আমাদের বারে আমরা তিন জন বৃত্তি পরীক্ষা দিয়েছিলাম, তিন জনই বৃত্তি পেয়েছি। প্রাইমারী স্কুলের পর আমরা ভাল স্কুলে চলে গেছি। আমরা সবাই এখন দেশের বাইরে প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু স্যার যেখানে ছিলেন, সেখানেই রয়ে গেছেন।

আমার প্রায় শেষ। একটু বস। আমাকে দেখেই বলে উঠলেন স্যার।

আমি স্কুল ঘরটা একবার ঘুরে আসলাম। সেই জরাজীর্ন ঘর। বসার টেবিল নাই, চেয়ার নাই, ঘরের বেড়া নাই অথবা ভাঙ্গা চোরা।

ফিরে আসার সাথে সাথে স্যার উঠে আমাকে জড়িয়ে ধরলেন। দেখ, ওর নাম রাজীব। ছেলে গুলোকে উদ্দেশ্য করে বললেন স্যার। এক সময় তোমাদের মত সেও এই স্কুলে পড়তো। এখন আমেরিকা থাকে। তোমরাও যদি ভাল মত পড়াশুনা কর, ওর মত উন্নতি করবে। এখন বাড়ী যাও। কাজ কর্মের ফাঁকে যতটা সময় পাও, হোম ওয়ার্কগুলো শেষ করার চেষ্টা করবে। কাল আবার দেখা হবে।

ছেলেগুলো স্যারকে সালাম জানিয়ে যার যার পথে চলে গেলো।

চল, আমাদের বাড়ীতে চল। তোমার চাচী দেখলে খুশী হবে।

আজকে না স্যার। আছিতো কয়েক দিন। কাল-পরশু এক দিন যাবো। আমাদের বাড়ীর সামনে যে আনু ভাই ছিলেন, ওনার সাথে একবার দেখা করতে চেয়েছিলাম। উনি কই থাকে জানেন?

জানি, চল।

স্যার, টাকাটা এবার দিতে পারলাম না। আমি দুঃখিত গলায় বললাম। রিক্তার ...।

কথা শেষ করতে দিলেন না স্যার। না না তাতে কি। বোনের বিয়ে ..., খরচতো হবেই। যখন পারবে, তখন দিবে। দেখলেতো স্কুল ঘরের অবস্থা। যে কোন সময় ভেঙ্গে পড়তে পারে। তখন গাছ তলা ছাড়া গতি নেই। এম, পি সাহেব মায়ের নামে আরেকটা স্কুল হবার পর আমাদের স্কুলের সাহায্যও কমে গেছে; ছাত্রও কমে গেছে। আনুর কথা জান কিছু?

কিছুটা জানি স্যার। শুনছি, বেলু চাচার কাছে জমি বেচে কোথায় উঠে গেছে।

কথাটা অর্ধ সত্য রাজীব। জমিটা বেচে নাই; জোর-জবরদস্তি করে বেচানো হয়েছে। আনু একটা দোকান দিয়েছিল ওর বাড়ীর সামনে। তোমার চাচার পছন্দ হয় নাই। এক রাতে পুরো দোকানটাই হাওয়া। এর সাপ্তাহ দুয়েক পর আনু তোমার চাচার কাছে জমি বেচে নদীর পাড়ে উঠে এলো।

স্যারের কথা শুনে মনটা আরো খারাপ হয়ে গেলো।

সূর্য্য ডুবছে পশ্চিম আকাশে। আমরা নদীর পাড়ে চলে এসেছি। ঐ যে আনুর ঘর। স্যার হাত তুলে দেখালেন।

নদীর পাড় ঘেষে একটা ছাপড়া ঘর। ঘরের সামনে যেতে দেখি, একটা দশ-বার বছরের ছেলে গরুকে খড় দিচ্ছে।

স্যার, ওকে না আপনার কাছে দেখলাম বিকেল বেলা?

হ্যাঁ, ও আনুর ছেলে, কালাম। আমার স্কুলের সবচে সেরা ছাত্র। বছর তিনেক থেকে আনু অসুস্থ। কোন মতে খুড়িয়ে খুড়িয়ে সংসার চলছিলো। গত বছর থেকে সে পুরাপুরি শয্যাশায়ী। তখন থেকে বাপ, মা আর দুই বোনের সংসারের ভার এই ছেলের কাঁধে। এই ছেলে কামলা দেয়, এই বয়সে প্রাইভেট পড়ায়। ওর মা মানুষের বাড়ীতে বাড়ীতে কাজ-কর্ম করে। এতেই ওদের সংসার চলে।

আমরা ছাপড়ায় ঢুকলাম। না জানা থাকলে বিছানায় শোয়া কঙ্কালসার আনু ভাইকে দেখে আমি কখনো চিনতাম না। আমার মুখ দিয়ে কোন কথা বেরুলো না।

আমাদের দেখে খুশীতে আনু ভাইয়ের চোখ দুটো খুশীতে চক চক করে উঠলো। বস রাজীব। অনেক কষ্ট করে বললেন আনু ভাই।

আমি নিরস্ত করার ভঙ্গীতে হাত উঠালাম। মনে মনে বললাম, থাক আনু ভাই, আপনি চুপ থাকুন। আপনি চুপ করে থাকলেও আপনার হৃদয়ের নীল সরোবর আমি দেখতে পাচ্ছি।

কতগুলো নির্বাক মুহুর্ত কেটে গেলো।

কয় দিন থাকবেন রাজীব ভাই? আনু ভাবী প্রশ্ন করলেন।

আরো সাপ্তাহ খানেক।

চাচী আসছে?

হ, আসছে।

পারলে চাচীরে একবার নিয়া আইসেন।

দেখি।

আবার নিঃস্তব্ধতা। ঘরের এক কোনে একটা মেয়ে কেরোসিনের কুপি জ্বালিয়ে পড়ছে। বাইরে কালাম একটা চুলায় ধান সেদ্ধ করছে। নদী থেকে ঠান্ডা হাওয়া এসে ঘরে ঢুকছে বিনা বাধায়। আমি নির্বাক দাড়িয়ে থাকলাম পাথরের মুর্তির মতো।

মাটির উপর একটা পুরানো ছেড়া শাড়ী বিছিয়ে দিয়ে আনু ভাবী বললেন, বসেন ভাই।

আমি চমকে উঠলাম। না না, আইজ আসি ভাবী। আনু ভাই আসি। আমি আনু ভাইয়ের হাত ধরে বললাম। আনু ভাই তাকালেন। কিছু বলার চেষ্টা করলেন। কিন্তু কিছুই শোনা গেলোনা। ওনার দুই চোখে দুটো মুক্তা বিন্দু চকচক করতে লাগলো।

আসেন ভাই। খালি মুখে গেলেন। ঘরে কিছু নাই যে দিমু। আনু ভাবী বললেন দুঃখিত গলায়।

আমরা পথে নামলাম। আমি আর স্যার। আমরা হাটছি পাশাপাশি। আকাশে ফুটবলের মত একটা চাঁদ উঠেছে। ফক ফকে জোৎস্নায় ভরে গেছে দিগন্ত বিস্তারী মাঠ।

চল, তোমাকে এগিয়ে দিয়ে আসি।

না স্যার, আপনার আসা লাগবে না কষ্ট করে। আমি যেতে পারবো। আনু ভাইকে দেখে মনটা খারাপ হয়ে গেলো স্যার। টাকা পয়সা যা এনেছিলাম, রিক্তার বিয়েতে সব খরচ হয়ে গেছে। হাতে সামান্য কিছু থাকলেও কালামের জন্য কিছু টাকা দিয়ে যেতাম।

আল্লার দুনিয়া বড় বিচিত্র রাজীব। যাদের সাহায্যের প্রয়োজন, তারা কিছুই পায় না। আর যাদের দরকার নাই, তারা দশ হাতে সাহায্য পায় আর বিশ হাতে অপচয় করে।

আমার বুকের গভীর থেকে একটা দীর্ঘশ্বাস উঠে মিলিয়ে গেলো মাঠের শূন্যতায়।

সিডনী মে ১৪-১৭, ২০১০